ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1527-1533
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজকাহিনী’: শিল্পীর চেতনায় ইতিহাসের রূপকথায় পরিবর্তন

শেলী মুখার্জি, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট মহাবিদ্যালায়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the Bengali language, the beloved name for children's stories is Rupkatha (fairy tale). Scholars have interpreted this term in various ways—rupak katha (allegorical tale), rup (form/beauty) and katha (story), or even extraordinary tale, among others. Abanindranath Tagore is the master craftsman of Bengali children's fairy tales. With the publication of 'Shiladitya', 'Goh', 'Padmini', and 'Bappaditya' in the Bharati magazine in the year 1311 (Bengali calendar), the foundation of history-based Bengali fairy tales was laid. The consolidated form of these tales is the book ‘Rajkahini’. Drawing stories from Tod’s ‘Annals and Antiquities of Rajast'han’, Abanindranath presented historical narratives in refined colloquial prose, marked by vivid description and coherent imagery. He masterfully transformed adult history into children's stories, using the narrative style of fairy tales. With an artist's consciousness, he gave the history of the Rajputs the imaginative form of fairy tales in ‘Rajkahini’. In each of these stories, a radiant artistic spirit is interwoven with history and imagination. By turning historical facts into vivid narrative images, he created a unique and timeless contribution to Bengali literature.

Keywords: Rupkatha, Abanindranath Tagore, Rajkahini, Historical Fairy Tales, Bengali Children's Literature

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের ঠিক দশ বছর পরে জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ৫ নং আবাসে একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হয়েছিল, ভারতের সৃষ্টিকলার ইতিহাসে সেই দিনটির কথা চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, সেই শিশুটি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এলেন রঙ-রেখা, রূপ-রস ও ভাব-কল্পনার সাতমহলা একটি রহস্যপুরীর চাবি হাতে নিয়ে। ভারতের শিল্পদেবতা তাঁর ললাট লিপিতে আরও লিখে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভগীরথের মত সে যুগের মৃত চিত্রকলায় প্রাণ ফিরিয়ে তাকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করবেন। রূপ-সাধক অবনীন্দ্রনাথের রঙ-রেখার বিশাল সাম্রাজ্য, রূপতত্ত্ব ব্যাখ্যানের অমূল্যভাণ্ডার বাঙালি তথা সারা ভারতের গৌরব। অবনীন্দ্রনাথ যেমন চিত্রশিল্পী তেমনি লেখক পরিচয়েও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। অবনীন্দ্রনাথের লেখার মূল্য বাংলা সাহিত্যে অনন্য; কেবল গুণে ও স্বাদে নয়, বৈচিত্র্য এবং বিস্তারেও। কেবল লেখার জন্য বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়তা তিনি দাবি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর লেখার উৎসাহদাতা। আবনীন্দ্রনাথকে লেখবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে; কারণ মুখে মুখে জমাটি গল্প বলার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ।

বাংলা শিশুগল্পের প্রিয় নাম ‘রূপকথা’। প্রাণ ঢেলে দিয়ে গল্প বলতে না পারলে শিশু গল্প জমে না আর ‘রূপকথা’ তো শিশু জগতের অপরূপ কথা। ‘রূপকথা’র প্রথমে ‘রূপ’ চাই,যা হবে ধ্বনি আর শব্দ দিয়ে আঁকা ছবি; আর তারপরই চাই ‘কথা’। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রূপকথার রূপকার; লিখতে বসেও আঁকার তুলির মতোই

তিনি ধ্বনিকে, শব্দকে ব্যবহার করতেন- যা তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর’ বইটিতে লিখেছেন-

রবীন্দ্রনাথ একদিন বললেন,-

> “অবন, ছোটদের পড়বার মত বই বাংলা ভাষায় নেই। এ অভাব আমাদের ঘোচাতে হবে। তুমি লেখ। যাতে ছোটরা পড়ে আনন্দ পায় এমন বই লিখে ফেল-ছাপবো আমরা।”[১]

রবীন্দ্রনাথ মূলত শিশুসাহিত্য লেখার জন্যই আহ্বান জানিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে। ঐতিহাসিক তাৎপর্যে তিনি ‘শিশু’ শিল্পী কিন্তু শুধুমাত্র শিশুর শিল্পী তিনি নন। মুখ্যতঃ শিল্পী ও শিল্পগুরু রূপে খ্যাত হলেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর গদ্য একান্তভাবে রূপকথাধর্মী। তবে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের ‘রাজকাহিনী’ শুধু রূপকথা নয়, নয়টি গল্পের সংকলন ‘রাজকাহিনী’-র সবকটি গল্পের বিষয়বস্তু কর্নেল জেমস টডের লেখা ‘Annals and Antiquities of Rajasthan’ বা ‘রাজস্থান’ বইটি থেকে নেওয়া। শুধুমাত্র শিশু-কিশোর পাঠ্য বলে মনোরঞ্জনের জন্য কিছু কিছু বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন। ‘রাজকাহিনী’-র কাহিনিগুলি ঐতিহাসিক কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনিগুলিকে প্রকাশের জন্য লেখক অবনীন্দ্রনাথ ইতিহাস রসের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার আশ্চর্য রহস্যকেও মিলিয়ে দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজকাহিনী’-র জন্য রাজপুতানা বা রাজস্থানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকেই অবলম্বন করেছিলেন। টডের ‘রাজস্থান’ অবলম্বনে বাংলায় নাটক, কাব্য এবং উপন্যাস অনেক রচিত হলেও একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলা ছোটগল্প। স্বর্নকুমারী দেবীর ‘নবকাহিনী’ এবং অবনীন্দ্রনাথের ‘রাজকাহিনী’ বাদ দিলে অন্য কোন গল্পকারকে টডের ‘রাজস্থান’ অবলম্বনে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হতে দেখা যায় নি।

অবনীন্দ্রনাথ ‘রাজকাহিনী’-র গল্পগুলিতে রাজপুতানার ইতিহাসকে বেছে নিয়ে ছিলেন তার পিছনে ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্বদেশী মনোভাব, যা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। কিশোর পাঠকদের রাজপুতদের বীরত্ব, সাহস ও মহান ত্যাগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্রধানত ‘রাজকাহিনী’ লেখেন। ‘রাজকাহিনী’তে শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, হাম্বির, চণ্ড, রাণাকুম্ভ এবং সংগ্রাম সিংহের কাহিনি বলেছেন তিনি। কাহিনিতে ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন রূপকথার; ফলে শেষ পর্যন্ত কাহিনিগুলি দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হয়েছে। সেইজন্যে নিতান্ত পরিচিত কাহিনিগুলিও বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ‘বাংলার লেখক ও কবি’ বইটিতে প্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়–

> “লেখক ঐতিহাসিকের অনুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন। ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে ....।”[২]

উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসচর্চার প্রধান কারন ছিল নবজাগ্রত স্বাদেশিক চেতনা। পরাধীনতার যন্ত্রণা, গ্লানি আমাদের গভীরভাবে পীড়িত করেছিল। বাঙালি লেখকরা সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন আর সেইক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ অবলম্বন হয় টডের ‘রাজস্থান’ বইটি। রাজপুতদের শৌর্য-বীর্য, আত্মমর্যাদাবোধ, দেশপ্রেম, ত্যাগ, মহান আদর্শ – এই সব গৌরবের ইতিহাস রয়েছে টডের বইটিতে আর বাঙালি লেখকগোষ্ঠী সেই স্বজাতি মহত্ত্বের কথাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আপামর বাঙালি জাতির কাছে। এ প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেন বলেছেন –

> “The beginning of the nineteenth century introduced English language and European thought in Bengal. ……….. The writers, who had English models before them had nothing to do with religion although they did not shake off the Puranic tradition of religion and morality. To these new writers Tod’s Annals of Rajasthan opened rich field of new and detectable subject matter for their literary creations.”[৩]

টডের রাজপুত কাহিনি দু’টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। টড কবি চান্দ ও অন্যান্য উপজাতীয় চারণকবিদের রচিত মহাকাব্য, গাথা গুলি থেকে উপকরণ নিয়ে এবং পন্ডিত নিযুক্ত করে রাজপুতানার ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ফলে ঐতিহাসিক সত্যতায়

অনেকসময়েই ত্রুটি দেখা যায়। তবু বাংলা সাহিত্যে টডের 'রাজস্থান' কাহিনির গুরুত্ব অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ড: বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য' বইটিতে বলেছেন –

> "টডের রাজস্থান কাহিনীর গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলা বাহুল্য মাত্র। যে সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস, পূরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং ভৌগলিক আলোচনার সবেমাত্র সূত্রপাত হয়েছে। অতএব স্বভাবতঃই টডের নানাবিধ ত্রুটি ও বিশেষতঃ অনৈতিহাসিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে সমালোচকেরা নানা বিরূপ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তথাপি সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে রাজস্থানের ইতিহাস চেনার ব্যাপারে টডের গ্রন্থ অপরিহার্য –।"[৪]

'রাজকাহিনী'-র গল্পের জন্য অবনীন্দ্রনাথ টডের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন মূলতঃ ঘটনা ও চরিত্রগুলির প্রতি আকর্ষিত হয়ে কিন্তু টডের রাজপুত ইতিহাসের থেকে অনেকখানি সরে এসে অথচ মূল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন আর তাতেই অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা হয়ে উঠেছে একান্তভাবে রূপকথাময়। 'রাজকাহিনী' মোট নয়টি গল্পের সংকলন এবং সবকটি গল্পেই তিনি টডের ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন কোথাও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাননি। শুধু গল্পের কাঠামোর প্রয়োজনে কোনো কোনো জায়গায় কিছু কিছু ঘটনা বা তথ্য পরিত্যাগ করেছেন এবং কোথাও নতুন ঘটনার সংযোজন ঘটিয়েছেন একজন সার্থক গল্পকারের মতনই।

গল্পকার অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে ছিল অনন্ত শৈশবের রহস্য। অকালে পিতৃহীন বালক, বালক বয়সে উপেক্ষিত অবন ঠাকুরের মনে ছিল শৈশবের প্রতি আজন্ম টান এবং তিনি ছিলেন শিশুর মতই বন্ধনমুক্ত। শিশুর কল্পনাশক্তি যেমন সজীব, অক্লান্ত; গল্পের রথে ভর করে তারা পৌঁছে যায় চেনা-অচেনা রহস্যলোকে। রূপকথার গল্পকারকে গল্পের কাহিনি বোনার, বলার কৌশলকে রপ্ত করতে হয় তাদের মনোযোগকে ধরে রাখতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ইতিহাসের রঙিন কাহিনিকে রূপকথার মোড়কে এনে- ধ্বনি, শব্দ, ছবি দিয়ে গেঁথেছেন আর পৌঁছে দিয়েছেন শিশু-কিশোরের মনোলোকে। এই প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' বইটিতে লিখেছেন–

> "অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রসিক কথক, মা-দিদিমার মতো রসিয়ে শিশু-গল্প বলার ধারাটি তাঁর মনের গভীর হতে জিভের ডগায় থিতিয়ে বসেছিল। রবীন্দ্রনাথ এলেন মুখের কথাকে লেখনীর ডগায় প্রসারিত করার দাবি নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা-চেতনা ছিল স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রখর; সে তাঁর অলৌকিক চিত্র-প্রতিভার সহজ উপাদান।"[৫]

'রাজকাহিনী' বইটির কাহিনিগুলি ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ করে 'ছেলেদের' জন্যই গল্প লিখতে বসেছিলেন। রূপকথার ছদ্মবেশে এ ভাষা ছবির ভাষা, ভাবলোকের বার্তাবাহী স্বপ্নলোকের ভাষা। ফলে আস্তে আস্তে ইতিহাসের তথ্য রূপকথার রাজ্যে পৌঁছেছে। উদাহরণ হিসেবে 'রাজকাহিনী'-র প্রথম গল্পটির কথা বলা যায়। 'রাজকাহিনী'-র প্রথম গল্প 'শিলাদিত্য'; লেখাটিকে প্রায় লেখক অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে কারন টডের 'রাজস্থান' কাহিনিতে 'শিলাদিত্য' বিষয়ে খুব সামান্যই উল্লেখ আছে, অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গকে আরও বড় করে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরি করলেন। 'শিলাদিত্য' গল্পে সূর্যমন্দির, সূর্যের বরে সুভাগার গায়েব-গায়েবী নামের পুত্র-কন্যা লাভ, সুভাগার অকালমৃত্যু, গায়েবী সমেত সূর্যমন্দিরের ধ্বংস হয়ে যাওয়া- এসবই লেখকের নিজস্ব সংযোজন আর যুদ্ধক্ষেত্রে সূর্যকুন্ড থেকে সপ্তাশ্ব রথে শিলাদিত্যের উপস্থিত হওয়া, সূর্যকুন্ডের জল অপবিত্র হওয়া, শিলাদিত্যের মৃত্যু- এইসব টডের 'রাজস্থান' অনুসরণে লেখা।

'গোহ' গল্পটিতে টডের কাহিনি অনুসরণ করেও গোহকে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী করতে কিছু কিছু ঘটনাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন; বেশ কিছু চরিত্রও নতুন তৈরি করেছেন। 'বাপ্পাদিত্য' বা 'পদ্মিনী' গল্পেও শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিজস্বতা রয়েছে।

'বাপ্পাদিত্য' গল্পে রাজকুমারী শোলাংকীর চরিত্র অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি আবার 'পদ্মিনী' গল্পে পদ্মিনীর পরিচয় আলাউদ্দিনের কাছে প্রকাশের আগে তার উপযুক্ত পরিবেশ তিনি তৈরি করেছেন; মূল ঘটনার তুলনায় কিছুটা পরিবর্তিত রূপে উপস্থাপিত করলেন গল্পে। এমনভাবেই 'হাম্বির', 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ', 'চণ্ড', 'রানা কুম্ভ', '

সংগ্রাম সিংহ' ইত্যাদি সব গল্পেই লেখক কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে কাহিনিগুলিকে প্রকাশ করেছেন অবশ্যই মুল কাহিনিকে অবিকৃত রেখে। এই প্রসঙ্গে ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য' বইটিতে বলেছেন-

> "'রাজকাহিনী'র কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনিগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক কেবলমাত্র ইতিহাসের রসকেই পরিবেশন করেননি, সেই সঙ্গে রূপকথার দুর্লভ রসও পরিবেশিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, লেখক ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও সেগুলি শেষপর্যন্ত কালোত্তীর্ণ ও দেশোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।"[৬]

অবনীন্দ্রনাথের মনের সৃজনশীলতা ছিল অবাধ, নিয়মবন্ধনের বাইরে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে রাজপুত রঙিন চিত্র এবং হিন্দু শিল্প-ঐতিহ্যের সংস্পর্শে রাজপুত ইতিহাসের মহিমা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে লেখা শুরু হয় 'রাজকাহিনী'র গল্পগুলি। এইসময় বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রস্তুতি। রাজপুত ইতিহাস সেই স্বদেশপ্রেমী মনকে টেনে নিয়েছিল; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস ও শিল্পচেতনার অপূর্ব প্রকাশ 'রাজকাহিনী'। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন-

> "আসলে জেমস টড-এর রাজপুত-কথা 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান' থেকেই প্রধানত সংগৃহীত হয়েছিল 'রাজকাহিনী'র গল্প-উপাদান। ....টড নিজেও বলেছেন, তাঁর সংগ্রহের এক প্রধান উৎস ছিল চারণ কবিদের গান,এবং লোকপ্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। ....রাজপুত ইতিহাস-কথার মতোই টড-এর 'রাজস্থান' -ও অজস্র অলৌকিক গালগল্পে ভরা। .....রক্তবাহিত ঐতিহ্যের মতো প্রাসঙ্গিক অলৌকিকতাও ইতিহাসের অচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে গেছে।"[৭]

অবনীন্দ্রনাথের গল্পগুলো ছোট-বড়ো নির্বিশেষে সকলের। সকলেরই একান্ত আপন, জীবনের চেয়েও বাস্তব, অজ্ঞেয় পরাবাস্তবের ছায়া। ইতিহাস ও বাস্তবের সঙ্গে রহস্য, অবাস্তবের লুকোচুরি খেলা। আমরা 'শিলাদিত্য' গল্পটির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি। টডের রাজপুত কাহিনির শিলাদিত্য- রাজপুত ইতিহাসের আবছায়াময় অন্ধকার যুগে আমাদের নিয়ে যায়। সূর্যবংশীয় রাজা শিলাদিত্য রামচন্দ্রের উত্তরসূরী। টড বলেছেন, বল্লভপুর, সূর্যকুন্ড, সপ্তাশ্ব রথ- এইসব ঘটনা কিংবদন্তী। এই উপাদানটুকু নিয়ে গল্প লিখতে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট যেখানে আবছা, শিল্পী-মন সাজিয়ে গুছিয়ে যে ছবি তৈরি করল তা জীবনের চেয়েও বাস্তব। ইতিহাসের পাদপূরণ করলেন তিনি।

'রাজকাহিনী'তে ঐতিহাসিক উপাদান স্বল্প, তাই গল্পের বিপুল অংশ শিল্পীর খেয়ালী কল্পনায় গড়া।'শিলাদিত্য' থেকে 'পদ্মিনী'– ভাষা,প্রযুক্তি, বর্ণনা কৌশলের গদ্যরীতি বিভিন্ন। 'হাম্বির', 'চন্ড', 'সংগ্রাম সিংহ' গল্পে রয়েছে তির্যক হাসির আভা। তবে সব গল্পেই শিল্পীপ্রাণের অভিন্ন আভা। কথার মালা গেঁথে গেঁথে বাস্তব থেকে পালিয়ে নয় বাস্তব জীবনের চেয়েও বড় সত্য ধরেছেন তিনি। গল্পের বিষয়, প্লট, চরিত্র, ছবি আর কথাকে বিচিত্রভাবে পরিবেশন করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্যকে ছবির ভাষায়, কথায়, কথকতায়, রূপকথায় বিচিত্র রূপ দিয়েছেন। তাঁর অন্তর্ভেদী জীবনদৃষ্টি রূপকথার সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টি ও জ্ঞানদৃষ্টির সমন্বয় করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'স্মৃতিচিত্র' বইটিতে প্রতিমা দেবী বলছেন–

> "অবনীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই ছিল কৌতুকপ্রিয়। তাঁর ধরন-ধারন চলা-বলা সমস্তই একটি বিশেষ স্বকীয়তাকে প্রকাশ করত। তাঁর গলার আওয়াজে একটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর সমতুল্য গলার আওয়াজ পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো শুনিনি।"[৮]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে মন এগিয়ে চলে আর শুনতে শুনতে ফুটে ওঠে ছবি। উপমার ঝংকারে একটা করে ছবি ফুটে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়। এইভাবে একটার পর একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো।আসল কথা, শব্দের ছকে মনের সুর জমিয়ে ছবি আঁকেন তিনি- এখানেই তাঁর অতুলনীয়তা।

বিশ শতকের সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন ও সকল লেখকের আমদানি ঘটুক, জীবন ও সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান শূণ্যস্থানটি পূর্ণ করে প্রগতিচিন্তার নতুন দ্বার উন্মুক্ত হোক ও সাহিত্যজগতে নবজীবন দেখা দিক – এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা।

আর সেই আশা নিয়েই ১৮৯৫ সাল থেকেই অবনীন্দ্রনাথকে কলম ধরতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। বিশ শতকের গদ্যের নবপর্যায়ে চলিত গদ্যের ব্যঞ্জনা নির্মাণ করে গদ্যরীতিকে অন্য মাত্রা দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। চলিতের আধারে তাঁর স্বকীয় গদ্যরীতি 'অবন ঠাকুরের ভাষা' বিশ শতকের গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিরাট অবদান তৈরি করেছিল। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বাংলার লেখক ও কবি' বইটিতে বলছেন–

> "আমাদের গণসাহিত্য নিতান্তই আমাদের জন্য লিখিত। রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুননা কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদারক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন: যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু। ..... শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর আসনের অধিকারী হইতে পারেন: কিন্তু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের গৌরব এই যে, সাহিত্যের আসরে তিনি নিম্ন আসনে বসিয়াছেন, একেবারে মাটির উপরে, সম্রাট অশোকের মত। মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।"[৯]

বাংলা গদ্যে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্টাইল শব্দ এবং ছবি, যাকে অবন ঠাকুরের ভাষা বলা যায়। অবন ঠাকুরের বাংলা গদ্যরূপ আটপৌরে চলিত– কথাচ্ছলে লেখা– এও তাঁর ছবির মতোই শিল্পী-মনের তপস্যা ও সচেতন অধ্যবসায়ের ফসল। কথ্য ভাষার আবেদন শ্রুতি-নির্ভর, প্রত্যক্ষ। কান ও চোখের মধ্যে দিয়ে শিল্পী বা কথক পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। লেখার ভাষায় দূর থেকে অচেনা অদেখা মনকে স্পর্শ করার আকাঙ্খা, যার থেকে জন্ম নেয় গুছিয়ে বলার আগ্রহ। আর এই লেখা তৈরি হয় অবনীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুরের ভাষার কাঠামো। 'রাজকাহিনী'র লেখ্য চলিত গদ্য তারই একটি রূপ। পরিশীলিত, পরিমার্জিত বাক্-ভঙ্গি, লিখিয়ের মেজাজটিকে বলিয়ের ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন করে নতুন ধরনের ভাষা শৈলী তৈরি করেছেন অবনীন্দ্রনাথ।উনিশ শতকে বা বিদ্যাসাগরের হাতে যে প্রাঞ্জল, রসাশ্রয়ী গদ্য তৈরি হয়েছিল তারও মূলে ছিল মুখের ভাষার ভিত। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখায় যে অনায়াস, সাবলীল, জীবন্ত গদ্যরূপটি তৈরি হয়েছিল। বিশ শতকে 'অবন ঠাকুরের' ভাষাতে সেই সাবলীলতার নিপুণ ও উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। 'বুড়ো আংলা', 'নালক'– এ হুতোমের কৌতুকবুদ্ধি, কথ্য বাকরীতির সজীব অনুকরণে 'রূপদক্ষ' কলা কৌশল-কে অবলম্বন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। কথ্য শব্দের কেবল আটপৌরে, অশিষ্ট অপপ্রয়োগ নয়, বিচিত্র কলাকুশলতায় ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে অবন ঠাকুরের স্টাইলের শিল্প-পরিণতি, পড়ামাত্রই শিশু-কিশোর পাঠক তার মজা নেয়। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর বক্তব্য নিয়ে বলতে পারি,

> "রাজস্থানের বীরপুরুষ ও রমনীরা ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের লোক, কিন্তু রাজকাহিনীর জগতে আসিয়া যখন তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন তখন তাঁহারা কালোত্তীর্ণ দেশোত্তীর্ণ ব্যক্তি; তাঁহারা রূপকথার মানুষ। তখন আর তাঁহাদের বয়সের প্রশ্ন, স্বভাবের প্রশ্ন মনে ওঠেনা। সংসারে মানুষ জীবন যাপন করে; যাপন শব্দের মধ্যে গতির ইঙ্গিত আছে, কিন্তু রূপকথার জগতে নরনারী লীলা করে মাত্র; লীলার মধ্যে চঞ্চলতা আছে, কিন্তু গতি নাই।"[১০]

অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'র কিছু অংশ উদ্ধার করে দেখলেই এই উদ্ধৃতির অর্থ বোঝা যায়। যেমন – 'বাপ্পাদিত্য' গল্পে রানী পুষ্পবতী নিজের কালো চুলের চেয়েও মিহি, আগুনের চেয়েও উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু সোনার ছুঁচে ফোঁড় দিচ্ছেন, চাঁপার কলির মতো আঙ্গুলে সেই ছুঁচ বিঁধে গেল। তার একফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। অথবা 'পদ্মিনী' গল্পে সন্ধ্যায় অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটপট যেই ঘুমন্ত শিক্রে পাখির কানে পৌঁছল, সে সোজা বাদশাহের হাতে গিয়ে বসল। আলাউদ্দিন বুঝলেন, বাজপাখি নিশ্চয় কোনো শিকারের গন্ধ পেয়েছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দুখানি পান্নার মতো একজোড়া শুক-সারী উড়ছে। 'রাজকাহিনী'তে রূপকথার প্রধান দায়িত্ব বা রূপ বা ছবি সৃষ্টির, 'পদ্মিনী' গল্পে চিতোরেশ্বরীর আবির্ভাব, জৌহর ব্রতে আত্মবিসর্জন ইত্যাদি করুণ রূপসৃষ্টি, আবার কোথাও ভয়ংকর, কোথাও মধুর। 'রাজকাহিনী'র ভাষা চলিত রীতির কিন্তু তার চাল লিখিত ভাষার মতো সংহত, বক্তব্যে সংবৃত। ১৩১১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় যখন 'শিলাদিত্য','গোহ', 'পদ্মিনী', 'বাপ্পাদিত্য'

প্রাকাশিত হয় তখন থেকেই চলিত রীতির অপূর্ব বর্ণনা ও নিটোল ছবির লিখিত রূপ প্রকাশিত হল। চলিত গদ্যরীতির সংহত লিখিত রূপই অনুসৃত হয়েছিল 'রাজকাহিনী' বইটিতে। উদাহরণ দিয়ে 'বাপ্পাদিত্য' গল্পটি থেকে বলা যায় –

> "যদি কোন রাজপুত রাজা শিকারে যেতে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত – রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন।"[১১]

রাজপুত ইতিহাসের নীচু জাত বা ভীলেদের উপর রাজাদের অত্যাচার, ভীল বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির জাত্যাভিমান এইসব ইতিহাস উঠে এসেছে 'রাজকাহিনী'র মধ্যে দিয়ে। 'রাজকাহিনী' রাজার কাহিনি নয়, রাজপুতানার বা রাজস্থানের ইতিহাসের অন্যরূপ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় ইতিহাসকে, কল্পকথাকে, বয়স্ক জীবনের অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন- ঘৃণা, হিংসা, প্রেম দেখিয়েছেন কিন্তু সেগুলোকে এমনভাবে বদলে দিয়েছেন যে তাদের চেনাই যায় না, অথচ ঠিক চেনাও যায়। এই কলাকৌশলই চিত্রশিল্পীর দান বাংলা সাহিত্যের জগতে। তাঁর লেখা প্রায়ই রূপকথাধর্মী হলেও রূপকথা নয়, শিশুমনকে ভরিয়েও বড়োদেরও টেনে আনে বিশ্বের দরবারে। রূপকথার ছদ্মবেশে এ গদ্য ভাবলোকের বার্তাবাহী স্বপ্নলোকের ভাষা। যেখানে নিত্য-জীবনের সত্য বাঁধা থাকে। শিশুগল্প কৌশলে বড়োদের মনকে নাড়া দেয়। লেখার প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "'শকুন্তলা' পড়ে 'রবিকাকা' যেদিন ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন, তারপর থেকেই মনের আগল গেল খুলে।- তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম, - ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। …"[১২]

রচনারীতি, বাক্য, বাক্‌শৈলী, শব্দ যোজনা ও বিন্যাস- এ সব কিছু নিয়ে কত বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি। লেখার ভাষা আর মুখে বলার ভাষার মধ্যে দুস্তর ফারাক। সেই ফারাক ঘুচিয়ে আগাগোড়া মার্জিত শালীন বাগভঙ্গি ও আটপৌরে শব্দের গদ্যশিল্প রচনা করলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও গভীরভাবে টডের বাস্তব-কল্পনায় মেশানো, লৌকিক-অলৌকিক 'রাজকাহিনী' র গল্পে। জীবনের চেয়েও বাস্তব, পরাবাস্তব, অতীতচারিতা নিয়ে এক আবছায়া রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের।

তাই পরিশেষে বলতে পারি, বাস্তব থেকে না পালিয়ে বাস্তব জীবনের চেয়েও পরাবাস্তবে উত্তরণের কল্পরথ হিসেবে 'রাজকাহিনী' সার্থক রূপকথা। 'রাজকাহিনী'র কল্প-জগতে হাত বারিয়ে ইতিহাসের আনকোরা তথ্য ওখান-এখান থেকে মুঠো ভরে উঠে আসে; তথ্যের কাঠামোয় রূপকথার মূর্তি। সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, ইতিহাস ও রোমান্সের সহাবস্থান পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনার গুণে ও কাহিনির উপস্থাপনায় টডের 'রাজস্থান' কাহিনি ইতিহাস ছাপিয়ে রূপকথায় পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, অলোকেন্দ্রনাথ। ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর। খসড়া খাতা, ১৯৪২, কলকাতা, পৃ: ২৪।
২. বিশী, প্রমথনাথ। বাংলার লেখক ও কবি। করুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ: ৮৪-৮৫।
৩. Sen, Sukumar. Lecture on Rajasthan and Bengal in literary contact on 10.12.75 at the Rajasthan Information Centre, Calcutta.
৪. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য। পুস্তক বিপণি, বৈশাখ ১৩৫৭, কলকাতা, পৃ: ১৮০।
৫. চৌধুরী, ভূদেব। লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ: ৫৫।
৬. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য। পুস্তক বিপণি, বৈশাখ ১৩৫৭, কলকাতা, পৃ: ১৮৪।
৭. চৌধুরী, ভূদেব। লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ: ৭৪।
৮. দেবী, প্রতিমা। স্মৃতিচিত্র। সিগনেট প্রেস, আশ্বিন ১৩৫৯, কলকাতা, পৃ: ৬৯।
৯. বিশী, প্রমথনাথ। বাংলার লেখক ও কবি। করুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ: ৭৩।
১০. তদেব, পৃ: ৭৮।
১১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। রাজকাহিনী। মাইতি বুক হাউস, ২০১৪, কলকাতা, পৃ: ৩৩।
১২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রানী। জোড়াসাঁকোর ধারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক ১৩৫১, কলকাতা, পৃ: ১২৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য। পুস্তক বিপণি, বৈশাখ ১৩৫৭, কলকাতা।
২. চৌধুরী, ভূদেব। লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬, কলকাতা।
৩. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। রাজকাহিনী। মাইতি বুক হাউস, ২০১৪, কলকাতা।
৪. ঠাকুর, অলোকেন্দ্রনাথ। ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর। খসড়া খাতা, ১৯৪২, কলকাতা।
৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ও চন্দ, রানী। জোড়াসাঁকোর ধারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কার্তিক ১৩৫১, কলকাতা।
৬. দেবী, প্রতিমা। স্মৃতিচিত্র। সিগনেট প্রেস, আশ্বিন ১৩৫৯, কলকাতা।
৭. বসু, সুধা। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৭৫, কলকাতা।
৮. বিশী, প্রমথনাথ। বাংলার লেখক ও কবি। করুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৬৭, কলকাতা।
৯. সেন, সুকুমার। বাংলার সাহিত্য ইতিহাস। সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৬৫, কলকাতা।